চারদেয়ালের ইদ: বন্ধুত্বের বিচ্ছেদই যেখানে কাম্য

অ ব নি অ না র্য

আকাশে চাঁদ উঠলে সবার দেখার কথা থাকলেও চার দেয়ালের কারাগারে থাকার সুবাদে ইব্রাহিম মিয়ার কাছে সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য ইদের চাঁদ যে তিনি একদম দেখেনইনি, এমন নয়। তবে, সেটা "চাঁদ দেখা গেছে"– এ-ঘোষণা রাষ্ট্র হবার পর, জেলখানার বিশেষ ঘণ্টা বাজানোর পর; হয়তো দায়সারাভাবে দেখা। ঠিক দায়সারা গোছেরও নয়, আবার ছেলেবেলার মতো ঘটা করে (হৈ-হুল্লোড় করে, ইফতার শেষ না করেই, নির্দিষ্ট খোলা ময়দানে গিয়ে ইদের চাঁদ দেখা না যেতেই চাঁদ দেখা গেছে মর্মে চিৎকার চেঁচামেচি, এমনকি 'রমজানের ওই রোজার শেষে এলো...গান ধরা ইত্যাদি) চাঁদ দেখার মতোও নয়। বস্তুত, এ এক বিশেষ টান। ইব্রাহিম মিয়া নিজেই বলেন– আমার জীবনের সবকিছু মিলিয়ে ইদের চাঁদ দেখার আয়োজন বা প্রকৃত অর্থে ইদ উদযাপন করার সুযোগ নাই। আর সুযোগের চূড়ান্ত অভাব দীর্ঘমেয়াদী হলে ক্রমে সেটা ইচ্ছাশক্তিকেই ধ্বংস করে। তেমনই, ইব্রাহিম মিয়ার সে-অর্থে ইচ্ছাও নাই। তবে তিনি চাঁদ দেখেন। তাঁর কথায়– চাঁদ দেখি, এশার নামাজের জন্য ওযু করতে উঠলে তখন একবার দেখি। একদম না দেখার কথা ভাবতে পারেন না তিনি। আবার সাঁইত্রিশ বছরের টান তিন বছরের অনিচ্ছার কাছে হার মানবে কেন! তাই চাঁদ দেখার এই লগ্নটা খানিক আগিয়েই নিয়ে আসেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন সেটা, একটু হেসে বলেন– অবশ্য এশার নামাজটা অন্যান্য দিনের চাইতে একটু আগেই পড়ি সেদিন। এতে তাঁর চাঁদ দেখার প্রতি টানটা বোঝা যায়। 'না-কি ইদের প্রস্তুতির জন্যই আগে পড়েন?'– এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, না। প্রসঙ্গত ছোটবেলার ইদপ্রস্তুতির বিষয় চলে আসে– ইদের চাঁদ দেখা যাওয়ার পর প্রাথমিক দায়িত্ব সমবয়সীদের সাথে হল্লা করা হলেও, খুব বেশি দেরি করার সুযোগ নাই। কেননা, ইদ উদযাপনের সর্বশেষ প্রস্তুতি শুরু করতে হতো, যেমন ইদের জামাগুলোর সর্বসাম্প্রতিক পরিস্থিতি (ইস্ত্রির কাজ যেহেতু সারা হতো বালিশের নিচে জামা-কাপড় চাপা রেখে, ফলত, মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি চাপের কারণে বিশ্রি ভাঁজ পড়তো, সেটা শেষবারের মতো সাবধানে চাপা রাখা), চৌকি কিংবা কোনো বিছানার ওপর উঠে সদ্য-কেনা ইদের স্যান্ডেলটা পায়ে দিয়ে দেখা মাপ ঠিক আছে কি-না, স্যান্ডেলের ফিতার ভেতরে-বাইরে ধারালো অংশ আছে কি-না, থাকলে ব্লেড দিয়ে কেটে সমান করা ইত্যাদি। এখন আর কী! তার চেয়ে বরং পায়ের বেড়ি সামলানোর বিষয়টা প্রাধান্য পায়। নামাজের সময় বেড়ি সামলানোর ঝক্কি কম নয়। অন্যান্য সময় সেটা মেনে নিলেও ইদের নামাজের সময় একটু বেশি খারাপ লাগে। কিন্তু বেড়ি খুলে দেয়া তো সম্ভব নয়, বিশেষত, যেখানে হাজারা হাজার আসামী একসঙ্গে নামাজ পড়তে আসে। এ-বিশাল সম্মিলনী সামলানো কর্তৃপক্ষের জন্য ভীষণ কষ্টকর, খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণও! এমনকি, সে-কারণে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এগারো বারো হাজার আসামীদের জন্য তিন চারটা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জামায়াত হয়। ঝুঁকির প্রশ্নে ইব্রাহিম মিয়া অবশ্য নিজেও সতর্ক। তাই নিজেই বললেন, আসলে এটা নিয়ে কোনো অভিযোগ নয়, বরং নিজের উপরই ঘেন্না এসে যায়। কর্মদোষেই নামাজ পড়তে হয় বেড়ি পরে।

গত তিনবছরে পাঁচটির মতো ইদ তিনি এ-চৌকোবাকশোটিতেই কাটিয়েছেন। একে ইদ যাপন বলা যাবে না কোনোভাবেই, বরং ইদের সময়টুকু অতিবাহিত করেছেন বলাটা অধিক যুক্তিসঙ্গত। তবে সময়টুকু একটু অন্যরকম কাটে, বলা যায়, ভালোই, আনন্দেই, স্বীকার করেছেন ইব্রাহিম মিয়া। সবকিছুতেই কেমন একটা সুর-আনন্দধ্বনি নাকি শুনতে পান তিনি। কল চাপার শব্দ, ট্যাপের পানি পড়ার শব্দ, কারো প্লেট-গ্লাস-বাটি পড়ার শব্দ, এমনকি খোদ নিজের কিংবা অন্য কারো পায়ের বেড়ির শব্দেও নাকি একধরনের ঐকতান অনুভূত হয়।

অবাক লাগে, যখন দেখেন অন্য কোনো আসামী ইদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কী অদ্ভুত! মন্তব্য করলেন তিনি। অবশ্য এটা কোনো অন্যায় নয়। আতর মাখানো, সারাদিন নতুন টুপি পরে থাকা, অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশি দামি বা সংখ্যায় একটু বেশি বিড়ি-সিগারেট টানা... বেশ ভালোই তো লাগে। তবে একটা জিনিস ইব্রাহিম মিয়া সবার সঙ্গে শেয়ার করেন। সেটা হলো কর্তৃপক্ষের দেয়া একই সেমাই বা মিষ্টি নিজেদের মধ্যে বিলি করে বেড়ানো, যেন বা যার যার নিজেদের বাড়ির মিষ্টি পরস্পরকে বিলি করছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, যুক্তরাজ্যের উডহিল কারাগারে ইদ কাটানো উগ্রবাদি সন্দেহে আটককৃত একজন বাবর আহমাদের নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা- সবাই যার যার বাড়ি থেকে পাঠানো চকলেট, মিষ্টি ইত্যাদি পরস্পরকে বিলি করেছে, এমনকি আগের শত্রুতা কিংবা কারাগারের ভেতরের কোনো দুর্ঘটনার দরুণ সৃষ্ট মনোমালিন্য বা গভীর শত্রুতার পরও ইদের দিন সেসব বেমালুম ভুলে সালাম বিনিময় করেছে, নিজহাতে মিষ্টিমুখ করিয়েছে, নেহাত করতে হয় বলে নয়, ভেতর থেকেই যে করেছে সেটা স্পষ্ট। এবং আরো আশ্চর্য ইদের বদৌলতে সেসব শত্রুতাও বন্ধুতায় রূপ নিয়েছে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও অন্যান্য বন্দির সংখ্যা সামান্য ছিলো না। ইদ যেন সবাইকে বদলে দিয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কয়েদিরা এতে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলো, পুরনো শত্রুর সঙ্গে কোলাকুলি!, ভেবেছিলো সাময়িক লোক-দেখানো বা আচারসর্বস্ব। পরে ওটার মাহাত্ম্য দেখে অন্যান্যরা উৎসাহিত হয়ে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন বাবর।

বাচ্চাদের ইদ-আনন্দ হৈ-হুল্লোড়-বাঁশি-নতুন কাপড়ে, বড়োদের আনন্দ ছোটদের আনন্দ দেখে, তাদের মুখে হাসি ফোটানোর আনন্দ। কারাগারে আসামীদের আনন্দ তারা ছাড়া অন্যদের ইদের পোষাক-হল্লা-আনন্দে। তাই নিজেদের মধ্যে আনন্দের একটা আয়োজন হিসাবে জেলের ভেতরের ওসব আদান প্রদান প্রধান ভুমিকা পালন করে। আবার নারী-পুরুষের কথা বিবেচনা করলে পুরুষদের ইদের প্রধান আনন্দ বাইরে- ইদগাহ, দোকানে কিবা এখানে ওখানে আড্ডায়, আর নারীদের প্রধান আনন্দ ভেতরে- রান্নাবান্না, এতদ্বিষয়ে নিজের যতোরকমের পা□ত্য আছে সেটা প্রমাণ করাতে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যাওয়াতে, বলছিলেন ইব্রাহিম মিয়া। এই জন্য আমরা তো তাও ইদের নামাজের মাধ্যমে কিছুটা ইদ করতে পারি, মেয়েদের সে সুযোগও নাই। তারা তো আর এখানে রান্না করতে পারে না। আশ্চর্য!, সম্পুর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে হুবহু একই মন্তব্য করেছিলেন শরীফা। ফলে, ইব্রাহিম মিয়ার মুখে যেমন রোষের খানিকটা কমতি দেখা গিয়েছিলো প্রসঙ্গটি বলতে গিয়ে, ততোধিক ক্ষোভের সঙ্গেই কথাগুলো বলছিলেন শরীফা। নিজের বয়স সম্পর্কে তাঁর কোনো সঠিক ধারণা না থাকলেও, অনুমান করার অনুরোধে তাঁর উত্তর এসেছিলো তিরিশ। তাঁর অনুমানের চেয়ে বছর দশেক বেশি বয়সী মনে হয় (অবশ্য এটাও অনুমান নির্ভর, জানি

না কোনটা অধিক কাছাকাছি)। ইদ প্রসঙ্গে তাঁর একমাত্র পজিটিভ চিন্তা– তিনি শুনেছেন, ইদের দিন কিভাবে যেন অনেক আসামীকে সরকার বিশেষভাবে মুক্ত করে দেন। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পরের ইদেই তিরি ছাড়া পেয়ে যাবেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিগত চারবছর একই আশা পোষণ করেও বিশেষ কোনো ফল পাননি। বেড়ি প্রসঙ্গে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। হতে পারে এরা অভ্যস্ত। জেলে ঢোকার আগেও ছিলো, এখনও আছে। আগেরটি অদৃশ্য, নৈর্ব্যক্তিক; পরেরটি দৃশ্যমান, বাস্তব।

অরুপ সাহার আবেগ অনুভূতি বাস্তবিকই ভোঁতা হয়ে গেছে। অন্যান্য বিশেষ দিবসের সঙ্গে তেমন বিশেষ কোনো পার্থক্য তিনি খুঁজে পান না, কেবল নামাজ পড়ার বিশাল আয়োজন ছাড়া। নামাজের বিষয়টি ধর্মগত কারণে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, কিন্তু তোজাম্মেল সাহেবের কথা তিনি ভুলতে পারেন না। প্রথমত বয়স–সামাজিক অবস্থান–ধর্মগত সমস্ত দুরত্ব সত্ত্বেও পুরো জীবনে সত্যিকার অর্থে বন্ধুত্বের উপলব্ধিটা তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র তোজাম্মেল সাহেবের কাছ থেকে। বলতে বলতে অরুপ সাহা বেদনা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খানিক বাদেই, একটু রুক্ষস্বরে বলেছিলেন, আর তিনি বিদায় নিয়েছিলেন বছর দুই আগেকার ইদের দিনেই। তাঁর মতো অনেকেরই মনে ইদের আনন্দের পরিবর্তে প্রচ ক্ষোভ জমেছিলো। ক্ষোভের প্রসঙ্গ কেন আসলো, বারবার প্রশ্ন করলেও সে–প্রসঙ্গে তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। তোজাম্মেল সাহেবকে ভুলতে না পারার দ্বিতীয় কারণ ওটা।

অনেক দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর আমাদের কানে এলেও, দীর্ঘদিন একইসঙ্গে থাকবার কারণে, একই ভাগ্য (দুর্ভাগ্য!?) শেয়ারের কারণে এরকম অভাবিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ওঠাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা না ঘটলে বন্ধুত্বের সফল পরিসমাপ্তি কামনাই এখানে স্বাভাবিক।

এ এক আজব কুঠুরি! সময়ের প্রয়োজনে তীব্র–গভীর–সত্যিকারের বন্ধুত্ব যেমন এখানে প্রত্যাশিত, তারও চেয়ে গভীরভাবে প্রত্যাশিত এখানে বিচ্ছেদ। আর এ–বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করার ব্যাকুল বাসনা নিয়ে সবাই মিলিত হয় ইদগাহে– আল্লার কাছে দুহাত তুলে নিজের পাপ মোচনের অপার্থিব আর্জির চেয়ে প্রধান হয়ে ওঠে বন্ধুর পার্থিব শাস্তি লাঘবের আবেদন। অতঃপর কোলাকুলি;– পরের ইদে যেন আর দেখা নাহি হয়, হে বন্ধু, বিদায়!

. . . . . .

বানানের ফিরিস্তি: ইদ শব্দটা সাধারণত দীর্ঘ–ই (ঈ) দিয়ে শুরু হয়। এখানে হ্রস্ব–ই (ই) ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, শব্দটি বিদেশি (আরবি)।

aunarjo@gmail.com

http://www.mukto-mona.com/Articles/auboni_aunarjo/index.htm

http://www.somewhereinblog.net/blog/aunarjoblog